—মেয়েছেলের এজেহার? ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া গেল। মাঠে ধান চুরি হয়েছে, তাতে মেয়েছেলেকে এজাহার দিতে হবে কেন? কে বললে? এ কি মগের মুলুক নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল।—তা হলে আমি আজ্ঞে এই এখুনি চললাম।

ডাক্তারও বাইসাইকেলে উঠিয়া বলিল, যা, তুই নির্ভাবনায় চলে যা। আমি ও-বেলা যাব। চুরি করবার জন্যে ধান কেটে নিয়েছে—এ কথা বলবি না, বলবি, আক্রোশ বশে আমার ক্ষতি করবার জন্যে চুরি করেছে।

অনিরুদ্ধ আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল না পর্যন্ত, রওনা হইয়া গেল, পাছে পদ্ম আবার বাধা দেয়। সে ডাক্তারের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিল; গিরীশকে বলিল—গিরীশ, কামারশালের চাবিটা নিয়ে এসো তো ভাই চেয়ে।

ও-পারের জংশনের কামারশালার চাবি। গিরীশকে ভিতরে ঢুকিয়া চাহিতে হইল না, দরজার আড়াল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবিটা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। গিরীশ হেঁট হইয়া চাবিটা তুলিতেছিল—পদ্ম দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—ডাক্তার ও অনিরুদ্ধ অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে। সে এবার আধ-ঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া বলিল—একবার ডাক ওকে।

মুখ তুলিয়া একবার পদ্মের দিকে একবার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া গিরীশ বলিল—পেছন ডাকলে ক্ষেপে যাবে।

—তা তো যাবে। কিন্তু ভাত? ভাত নিয়ে যাবে কে? আজ কি খেতে-দেতে হবে না?

গিরীশ ও অনিরুদ্ধ সকালে উঠিয়া ও-পারে যায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের ভাত হইয়া থাকে—যাইবার সময় সেই ভাত তাহারা একটা বড় কৌটায় করিয়া লইয়া যায়। সেই খাইয়াই তাহাদের দিনটা কাটে। রাত্রে খাওয়াটা বাড়ীতে ফিরিয়া আরাম করিয়া খায়। গিরীশ বলিল—ভাতের কৌটা আমাকেই দাও, আমিই নিয়ে যাই।

* * *

পদ্ম সংসারে একা মানুষ। বৎসর দুয়েক পূর্বে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর হইতেই সমস্ত দিনটা তাহাকে একলাই কাটাইতে হয়। সে নিজে বন্ধ্যা, ছেলে পুলে নাই। পাড়াগাঁয়ে এমন অবস্থায় একটি মনোহর কর্মান্তর আছে—সে হইল পাড়া বেড়ানো। কিন্তু পদ্মের স্বভাব যেন উর্ণনাভ-গৃহিণীর মত।

সমস্ত দিনই সে আপনার গৃহস্থালীর জাল ক্রমাগত বুনিয়া চলিয়াছে। ধান-কলাই রৌদ্রে দিতেছে, তুলিতেছে, সেগুলি মাটি ও কুড়ানো ইঁট মাটি দিয়া গাঁথিয়া ঘরে বেদী বাঁধিতেছে; ছাই দিয়া মাজিয়াতোলা বাসনেরও ময়লা তুলিতেছে—শীতের লেপ-কাঁথাগুলি পাড়িয়া নতুন পাট করিতেছে। ইহা ছাড়া নিয়মিত কাজ—গোয়াল পরিষ্কার করা, জাব কাটা, খুঁটে দেওয়া, তিন-চারবার বাড়ী ঝাঁট দেওয়া এসব তো আছেই।

আজ কিন্তু তাহার কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। সে খিড়কির ঘাটে গিয়া পা-ছড়াইয়া বসিল। অনিরুদ্ধকে থানায় যাইতে বারণ করিয়াছে, হাসিমুখে রহস্য করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সে কেবল ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণের জন্য। অথচ ঐ দু-বিঘা বাকুড়ির ধানের জন্য তাহারও দুঃখের সীমা ছিল না। আপন মনেই সে মৃদুস্বরে ছিরু পালকে অভিসম্পাৎ দিতে শুরু করিল।

—কানা হবেন—কানা হবেন—অন্ধ হবেন তিনি;—হাতে কুষ্ঠ হবে, সর্বস্ব যাবে—ভিক্ষে করে করে খাবেন।

সহসা যেন কোথায় প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে বলিয়া মনে হইল। পদ্ম কান পাতিয়া শুনিল। গোলমালটা বায়েনপাড়ায় মনে হইতেছে। প্রচণ্ড রূঢ়কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় কেউ তর্জন-গর্জন করিতেছে। ওই ছোঁয়াচটা যেন পদ্মকেও লাগিয়া গেল। সেও কণ্ঠ উচ্চে চড়াইয়া শাপ-শাপান্ত আরম্ভ করিল—

—জোড়া বেটা ধড়ফড় করে মরবে; এক বিছানায় একসঙ্গে। আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নির্বংশ হবেন—নির্বংশ হবেন; নিজে মরবেন না, কানা হবেন—দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথা-সর্বস্ব উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবেন।

বেশ হিসাব করিয়া—ছিরু পালের সহিত মিলাইয়া সে শাপ-শাপান্ত করিতেছিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, খিড়কির পুকুরের ওপারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিরু পাল তাহার গালি-গালাজগুলি বেশ উপভোগ করিয়া হাসিতেছে। এইমাত্র ছিরু পাতু বায়েনকে মারপিট করিয়া ফিরিতেছিল, বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই সেই বিক্রমোদ্ভূত। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর শাপ-শাপান্ত শুনিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে হাসির মধ্যে অন্য একটা ক্রূর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল। দেখিয়া পদ্ম উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে কি না? কিন্তু দিবালোককে তাহার বড় ভয়, সে স্পন্দিতবক্ষে দ্বিধা

করিতেছিল। সহসা পদ্মর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু বিকেলের একটা প্রতিবিম্বিত আলোকচ্ছটা তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

—ধার পরীক্ষে করতে এক-কোপে দুটো পাঁটা কেটে আমার কাজ বাড়িয়ে গেলেন বীরপুরুষ। রক্তের দাগ ধোয়া নাই—ঘরে ভরে রেখে দিয়েছেন। আমি এখন ঘাটে বসে ঝামা ঘষি আর কি।

পদ্মের হাতে একখানা বঁটি দা; রোদ পড়িয়া দাখানা ঝক্‌মক্ করিতেছে। তাহারই ছটা আসিয়া চোখে পড়িতেই ছিরু পাল চোখ ফিরাইয়া লইল। পরক্ষণেই দুম্-দুম্ শব্দে পা ফেলিয়া আপনার বাড়ীর পথ ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের মুখেও নিষ্ঠুর কৌতুকের একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চার

গ্রাম হইতে বাহির হইলেই বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল—প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি; এবং পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ তিন দিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। ইহার মধ্যে আবার শিবকালীপুরের সীমানার জমিই না কি উৎকৃষ্ট। এইটুকু অংশের নামই হইল 'অমরকুণ্ডার মাঠ' অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নাই। শিবপুরের জমির পরিমাণ এদিকে অতি অল্প; শিবপুরের সমস্ত জমি উত্তর দিকে। কালীপুরের চাষের মাঠ অধিকাংশই গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অর্থাৎ এই দিকে। শিব-কালীপুর নামেমাত্র দুইখানা গ্রাম; শিবপুর এবং কালীপুর, দুই গ্রামের বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রামখানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশী; শ্রীহরি, জেবু প্রভৃতি সকলেরই বাস এখানে।

শিবপুর গ্রামখানি বহু পূর্বে ছিল—ছোট একটি পাড়াবিশেষ; তখন অর্থাৎ বর্তমান কাল হইতে প্রায় আশী-নব্বুই বৎসর পূর্বে সেখানে একশ্রেণীর বিচিত্র সম্প্রদায় বাস করিত; তাহারা নিজেদের বলিত 'দেবল-চাষী'। তাহারা নিজ হাতে চাষ করিত না, শিব-কালীপুরের বুড়া শিবের সেবাপূজার ভার লইয়া তাহারা মাতিয়া থাকিত। এখন এই দেবল সম্প্রদায়ের আর কেহই নাই। অধিকাংশই মরিয়া-হাজিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক ঘর এখান হইতে

অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্তী রক্ষেশ্বর গ্রাম এবং ক্রোশ আষ্টেক দূরবর্তী জলেশ্বর গ্রাম—বাবা রক্ষেশ্বর ও বাবা জলেশ্বর এই নামীয় দুই শিবের আশ্রয় লইয়া পাওা হিসাবে তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাস করিতেছে। শিবভক্ত দেবলদের বাস ছিল বলিয়াই পল্লীটার নাম ছিল শিবপুর। দেবলেরা চলিয়া যাইবার পর কালীপুরের চৌধুরীরা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া শিবপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জাতি সদ্‌গোপ চাষীদের প্রত্যক্ষ সংস্রব এড়াইবার জন্যই তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। চৌধুরীরাই শিবপুরকে একটি স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শিবপুর স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমে যে গ্রামের মাঠ, সে গ্রামে নাকি লক্ষ্মী বসতি করেন না; গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যে গ্রামের চাষের সীমানা—সেখানে নাকি লক্ষ্মীর অপার করুণা। অন্ততঃ প্রবীণেরা তাই বলে। মাঠ উত্তর ও পশ্চিমদিকে হইলে দেখা যায়—গ্রাম অপেক্ষা মাঠ উঁচু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। বোধহয় গোটা পৃথিবী জুড়িয়া এইটাই এই ক্রম নিম্নতার জন্যই, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে কৃষিক্ষেত্র হইলে—গ্রামের সমস্ত জলই গিয়া মাঠে পড়ে; গ্রাম ধোয়া জলের উর্বরতা প্রচুর। ইহা ছাড়াও গ্রামের পুকুরগুলির জলের সুবিধা ষোল-আনা পাওয়া যায়। এই কারণে শিবপুর এবং কালীপুর পাশাপাশি গ্রাম হইলেও দুই গ্রামে জমির গুণ ও মূল্যে অনেক প্রভেদ। এজন্য কালীপুরের লোকের অনেক অহঙ্কার শিবপুরের লোককে সহ্য করিতে হয়। শিবপুরের চৌধুরীরা এককালে তাহাদের জমিদার ছিল, তখন কালীপুরকে শিবপুরের আধিপত্য সহ্য করিতে হইয়াছে; কালীপুরের বর্তমান অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য তাহারও একটা প্রতিক্রিয়া বটে।

দ্বারকা চৌধুরী সেই বংশোদ্ভূত। চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারকা চৌধুরীর একপুরুষ পূর্বে তাহাদের বংশের সমান সমৃদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে। চৌধুরীরও আভিজাত্যের কোন ভাণ নাই; পূর্বকালের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে; এক মজলিসে বসিয়া তামাক খায়—সুখ-দুঃখের গল্প করে। তবু চৌধুরীর কথাবার্তার ধরন ও সুরের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। চৌধুরী বেশী বলে খুব কম, যেটুকু বলে—তাহাও অতি ধীর এবং মৃদুস্বরে। কথার

প্রতিবাদ করিলে চৌধুরী তাহার আর প্রতিবাদ করে না। কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীর কথা সংক্ষেপে স্বীকার করিয়া লয়, কোন ক্ষেত্রে চুপ করিয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে সেদিনকার মত মজলিস হইতে উঠিয়া পড়ে। মোট কথা, চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরকে মানিয়া লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সকালেই ছাতাটি মাথায়—বাঁশের লাঠিটি হাতে লইয়া কালীপুরের দক্ষিণ মাঠে নদীর ধারে রবি-ফসলের চাষের তদ্বিরে চলিয়াছিল. কালীপুরের জমিদারীর স্বত্ব চলিয়া গেলেও—সেখানে তাহাদের মোটা জোত এখনও আছে। কালীপুরের দক্ষিণেই 'অমরকুণ্ডার মাঠ', পূর্বেই বলিয়াছি এখানকার ফসল কখনও মরে না, এ মাঠে হাজা-শুখা নাই। মাঠটির মাথায় বেশ বিস্তৃত দুইটি ঝর্নার জলা আছে; প্রশস্ত একটি অগভীর জলা হইতে নালা বাহিয়া অবিরাম জল বহিয়া চলিয়াছে; জলাটি কাণায় কাণায় অহরহই পরিপূর্ণ, জল কখনও শুকায় না। এই যুগ্ম-ধারাই অমরকুণ্ডার মাঠের উপর যেন ধরিত্রী-মাতার বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা। নালা বাহিয়া জলাভাবের সময় নালায় বাঁধ দিয়া, যাহার যে দিকে প্রয়োজন জলস্রোতকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়।

অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে সুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নদীর বাঁধের কোল পর্যন্ত, সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত অপূর্ব এক বর্ণ-শোভা ঝলমল করিতেছে। ধানের প্রাচুর্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্নার দুই পাশের বিসর্পিল বাঁধের উপরের তালগাছগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজও শরতের নীলের আমেজ রহিয়াছে; এখনও ধুলা উড়িতে আরম্ভ করে নাই। দূরে আবাদী মাঠের শেষপ্রান্তে নদীর বন্যারোধী বাঁধের উপর ঘন সবুজ সরবন একটা সবুজ রঙের দীর্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে; মাথায় চুনকাম-করা আলিসার মত চাপ বাঁধিয়া সাদা ফুলের সমৃদ্ধ সমারোহ বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

কালীপুরের পশ্চিম দিকে—সম্ভ্রান্ত ধনীদের গ্রাম কল্পনা; গ্রামের চারিপাশের গাছপালার উপর সাদা-লাল-হলুদ রঙের দালানগুলির মাথা দেখা যাইতেছে। একেবারে ফাঁকা প্রান্তরে স্কুল—হাসপাতাল—বাবুদের খিয়েটারের ঘর আগাগোড়া পরিষ্কার দেখা যায়। বাবুরা হালে টাকায় এক পয়সা